গোরস্তানের পদ্য : স্মৃতি ও জীবনস্বপ্ন

সিরাজ সালেকীন

গোরস্তানের পদ্য

স্মৃতি ও জীবনস্বপ্ন

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

শেষকথা, শুরুর আগে

কথার শেষ নাই। তেমনই জন্ম বা মৃত্যুরও আপাতত শেষ নাই। জন্ম ও মৃত্যু তথা জীবন নিয়েই কথা। এক্ষেত্রে বলা হয় জীবনের বিপরীত প্রান্ত মৃত্যু। জীবন সচল—সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি বা অর্থনীতির জনক। মৃত্যু তা নয়, এতে সবকিছুর অবসান ঘটে। অথচ জীবন প্রতিনির্ণীত হয় মৃত্যুর দ্বারা। ভালো বা মন্দ থাকা, নীতি বা অর্থনীতি, গভীরতর অস্তিত্বজিজ্ঞাসা সবই মৃত্যু থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া প্রসঙ্গ। জীবন তাড়া করছে মৃত্যুকে অথচ অতিক্রম করতে পারছে না। এজন্যই একদিক দিয়ে জীবনের নির্ধারক শক্তি মৃত্যু। মৃত্যুর অর্থ—তার সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃতি বা অর্থনীতি—নিয়েই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে জীবন। এজন্যই কিছু কথা জমা থাকে বা লিখিত হয় মৃত্যুর পরেও। যা কিছু সমাজের, মৃতের বা জীবিতের, অন্ত্যেষ্টি বা শেষক্রিয়াতেও তা শেষ হয় না। কিছু কথা ধাবিত হয় পরলোকের দিকে। এসবের সামান্যই লেখা হয়, বড় অংশ জমা থাকে হৃদয়ে। সমাজের কণ্ঠস্বর প্রকাশ্য হলেও ব্যক্তির হৃদয় সম্পূর্ণত তা নয়। মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির প্রকাশ-অপ্রকাশের ভার, জীবনের সক্ষমতা-অক্ষমতা, জিজ্ঞাসা, সঙ্গ-প্রসঙ্গ বা স্মৃতিময় আবেগ নিয়েই মূলত এই বই। সমাধিলিপি, বিশেষত কবিতা বা পদ্য এর অবলম্বন।

প্রায় তিন বছর সচেতনভাবে বিভিন্ন কবরস্থান, সিমেট্রি ও শ্মশান দেখার সুযোগ হয়েছে; বুঝতে পেরেছি এমন বলা যাবে না। এই বইয়ে স্থান

পেয়েছে মূলত গোরস্তানের সমাধিলিপি। সুযোগ এলে শ্মশান ও সিমেট্রিকে ভিন্নভাবে দেখতে চাই অন্য কোনো বইয়ে। ধর্ম-সামাজিক কার্যকারণে সাধারণভাবে মুসলমানদের সমাধি বা কবরে নাম-পরিচয়ের অতিরিক্ত লেখার প্রতিবন্ধকতা আছে। এরপরও কোনো কোনো সামাজিকবর্গে বিশেষ সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতি ও অর্থনীতির যোগসূত্রে ধর্মবোধ অভিযোজিত হয়, অথবা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটে মতাদর্শিক কড়াকড়ি। এসময় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ভিন্নমত। বর্তমান বইয়ে এমন দৃষ্টান্ত বহুস্থানে বিভিন্নভাবে পাওয়া যাবে। বিশ্বাসের বহু স্তর আছে ধর্মকাঠামোতে, ব্যক্তি বা পারিবারিক পর্যায়ে এর মান্যতায়ও আছে মাত্রাভেদ। এসবেরও প্রমাণ রয়ে গেছে সমাধিলিপিতে। মৃত্যুর পরেও মানুষ তার রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা পরিচয় বহন করে অথবা ভুলতে চায় না।

মানুষের জন্য বড় ঘটনা তার হৃদয়বৃত্তি। সম্পর্কের বহুমাত্রায় বহুরূপে তার প্রকাশ ঘটে। বাংলা সমাধিপদ্যেরও প্রাণ হৃদয়বৃত্তি। এক্ষেত্রে স্মৃতিময় আকুতি সামাজিক চাপকে অস্বীকারের স্পর্ধা দেখায়। আবেগ প্রায়শ স্বয়ংপ্রকাশিত যেন; একক ও নিঃসঙ্গ অনুরণনে মথিত। কারো দেখায়, ভিন্নমতে বা বিশ্বাসের কার্যকারণে সংকুচিত বা বিব্রত হওয়ার কিছু নেই! এই সাহসের উৎস নিশ্চিতভাবে আবেগ; দ্বিধাহীন একান্ত সম্পর্ক। সম্পর্কই স্মৃতির উৎস এবং এই ধারায় জন্ম নেয় সংরক্ষণের বোধ। সমাজ বস্তু জোগান দিতে পারে, প্রাণের সংস্পর্শ আনতে পারে কেবল সংবেদ্য হৃদয়। এজন্য সমাধিপদ্য একাধারে সরল সজ্ঞান উপস্থিতি জানান দেওয়ার ব্যাপার, অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির সারাৎসার। বীক্ষণের গভীরতায় এখানে হৃদয়ের রহস্যও স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে। এই সূত্রে চিন্তা ও আবেগ জন্ম দেয় নতুনতর ভঙ্গি। সাধারণ কথা লাভ করে নতুন মাত্রা। গোরস্তানে জন্ম নেয় জীবনের নানামাত্রিক বয়ান।

কবিতা রচনা কবিদের একাধিপত্য নয়। কবিতা প্রায়শ শব্দ-ব্যবসায়ী সামাজিকের ব্যতিক্রম; অনির্দিষ্ট ও আন্তরিক প্রকাশ। সাধারণ মানুষের সংবেদনশীলতাও হতে পারে এর উর্বর চর্চাক্ষেত্র। কবিতা চিন্তার সংহতি এবং প্রকাশের অনির্দিষ্ট রহস্যময়তার মেলবন্ধন; যখন খণ্ডিত বা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেও সামাজিকতা বা আন্তঃযোগাযোগের সুযোগ থাকে, তার মর্মমূলেও খেলা করে কবিতার দ্যুতি। বাংলা অঞ্চলে সাধারণ মানুষ ভাষিক ও

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কার্যকারণে অন্ত্যমিলের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট। সেই সাংস্কৃতিক মান, ভাষাভঙ্গির খেলা, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা আমাদের সামাজিকতা বা মানবমূল্যেরই অনিবার্য অংশ। এজন্য সামাজিকতা, ধর্মবোধ, অর্থনীতি ইত্যাদি সবকিছুই নৃতাত্ত্বিক আলোচনারও অংশভুক্ত। এই বই প্রধানত সমাজ-সংস্কৃতি এবং মানবমনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি নিয়েও অবহিত হতে চায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে।

বর্তমান বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সাতটি প্রবন্ধঃ 'স্মৃতি ও সংরক্ষণ', 'এপিটাফ নামের কবিতা', 'কবিদের সমাধিফলক', 'দাঁড়াও পথিকবর!', 'পারিবারিক স্মরণ', 'সামাজিক স্মরণ' ও 'মৃত্যু, মৃত্যুর অধিক'। আশা করি পাঠক এই ক্রমে বইয়ের কেন্দ্রীয় চিন্তার সূত্রটি ধরতে পারবেন। স্মৃতির কার্যকারণ বা সমাজমনস্তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্র অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই পরম্পরা যেমন মান্য, তেমনি সৃষ্টিশীল সংবেদনশীলতার প্রাচীনতর ঐতিহ্যও অস্বীকার করা যায় না। স্মরণের পরম্পরায় জন্ম হয় নতুন ধারার কবিতা; এতে কবিরা সরাসরি যুক্ত হন অথবা সমাজই লিখিয়ে নেয় কবিতা বা সমাধিপদ্য। সমাজের সঙ্গে তাই মৃতের আন্তঃযোগাযোগ ছিন্ন হয় না। কবরস্থান কেবল ঘুমের রূপকার্থ তৈরি করে না, সামাজিক প্রয়োজনেই তৈরি হয় পথ, আবির্ভাব ঘটে পথিকের এবং এরাই মৃতের জাগ্রত উত্তরসূরি। এভাবে জন্ম হয় বীরকথা; জাতীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তার মতাদর্শের স্মরণ ও পরম্পরা। তবে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রবণতাটি ভিন্নতর, একান্তই আত্মস্থ বা অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে কথা বা কবিতার শব্দে-ধ্বনিতে ক্ষরণ অস্পষ্ট থাকে না, অথচ তা নীরব ও স্তব্ধ; অন্যদিকে চেতনাস্রোত থাকে কল্লোলিত। এই স্তব্ধ অস্তিত্বই একাধারে ধারণ করে জীবন ও মৃত্যুর জায়মান রূপ।

বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তার প্রারম্ভিক পর্বে এবং প্রবন্ধগুলো রচনাকালে লেখকের স্মৃতিতে ভেসে থাকে পাঁচটি কবর। বড়-মা, দাদা, দাদি, মা ও বাবা সেখানে সমাহিত আছেন। একে একে এসেছেন, বস্তুগত চিহ্ন রেখে গেছেন সামান্যই। তারপর স্বজনেরা মাঝে মাঝে এ নিয়ে কথা বলে; প্রকাশ্যে নীরব থাকে দীর্ঘকাল। কার হৃদয়ের কথা কে কবে শুনেছে? এই না-শোনা কথাও হয়তো পরস্পরের সমাধিলিপি! এই বাড়ি থেকেই একদা

কয়েকজন চলে গিয়েছিলেন ত্রিপুরার উদয়পুর। তাঁদের উত্তরসূরিরা ফেলে যাওয়া কবরগুলোর কথা কি মনে রেখেছেন? মনে না থাকলে কি অস্তিত্ব থাকে? দাদি মাঝে মাঝে বলতেন ওখানে কবর আছে চারজনের। এখন কি সেখানে কেবলই শূন্যতা? না; সমতল জমি, এবার শীতকালে চাষ হয়েছে লালশাক! জীবনের রং বা রক্তাক্ত রূপ এভাবেই বিস্তৃত হয় প্রকৃতিতে! ভিন্নতর প্রয়োজন এসে স্মৃতিও কেড়ে নেয়, যেমন মৃত্যু ছিনিয়ে নেয় জীবনের প্রত্যক্ষ রং-রূপ।

লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজনের সাহায্য পেয়েছি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি অধ্যাপক সৌভিক রেজা, ড. সৈকত আরেফিন, শ্রী সদানন্দ মণ্ডল, জনাব মো. সাকিবুল হাসান, জনাব রাফাত আলম মিশু, জনাব নাজমুল হোসেনকে। এঁদের সঙ্গে ঘুরেছি বিভিন্ন শ্মশান, গোরস্তান ও সিমেট্রি। এই অভিজ্ঞতাও একধরনের সঞ্চয়। আমার শিক্ষক অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়েছেন। এই স্নেহ তুলনাহীন। ছবি তোলার অক্ষমতা আছে আমার। সে-সব আনাড়ি ছবি দিয়ে প্রাথমিক তথ্যের প্রয়োজন মিটেছে। বইয়ে ব্যবহৃত যথার্থ ছবিগুলোর বেশির ভাগ ধারণ করেছেন আনন্দ অন্তঃলীন; এগুলো বাছাই এবং সম্পাদনাও তাঁর। কিছু ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত। এছাড়া এস এম আব্রাহাম লিংকন, সৈয়দ তারিক, চরু হক, হেলাল উদ্দিন, রাজন মিয়া রাজন ও পারভেজের তোলা ছবিও ব্যবহৃত হয়েছে। বিচিত্রমাত্রায় আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন মুর্শিদা আক্তার ডেইজী। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কথাপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী জনাব জসিম উদ্দিনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই শিল্পী তন্ময় দাশগুপ্তর প্রতি দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদের জন্য।

সিরাজ সালেকীন
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্মৃতি ও সংরক্ষণ

কাকে বলে স্মৃতি? এটি একটি মানসিক পরিস্থিতি যেখানে তথ্যাদি জমা হয় এবং যাকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যায়। স্মৃতি তাই একদিকে সংরক্ষণের প্রক্রিয়া, অন্যদিকে সংরক্ষিত ভান্ডারবিশেষ। তবে ব্যক্তিবিশেষের মনের ধর্মে তা যৌক্তিক নিয়ম বা ক্রমধারায় চলে না। ব্যক্তির স্মৃতিতে উল্লম্ফন প্রবণতা নিয়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েড [১৮৫৬-১৯৩৯] এবং সামূহিক বা প্রত্নস্মৃতি নিয়ে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং [১৮৭৫-১৯৬১] প্রভূত আলোচনা করেছেন। তবে কি সামাজিক বিধানও যৌক্তিক পর্যায়ে থাকবে না? কিছুকাল আগেও আমাদের গ্রামীণ জীবনে প্রিয়জনের ব্যবহার্য দ্রব্যে বিশেষত রুমাল, পাখা ইত্যাদিতে দেখা যেত 'মনে রেখো', 'ভুলো না আমায়', 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভুলে না মোরে' বাক্যবন্ধ। কালের ধর্মেই কি হারিয়ে গেছে মনের বিশেষ আবেগ, নাকি অন্যত্র প্রকাশ পাচ্ছে অন্য কোনো রূপে? আবেগের রূপান্তর হতে পারে, প্রকাশ অনিবার্য। মনে রাখা, ভুলে না-যাওয়ার দাবি বা আবেগের নাম এখানে প্রেম। এর মাধ্যমে একটি হৃদয়, মন বা মানুষ আরেকজনের হৃদয়, মন বা জীবনের বিশেষ অংশ জুড়ে স্থান পেতে চায়। প্রেম কি কেবল প্রয়োজন? তারও অধিক

অস্তিত্বের অংশ, রক্তমাংসে সংবাহিত সংবেদন; জৈবিক স্মৃতি বা সংরক্ষিত স্মৃতির অভিমুখ। এজন্যই ব্যক্তির আবেগ সামাজিক রীতি ও প্রয়োজনের পথ বেয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তিন কালের সম্মিলন ঘটে; অতীত জেগে ওঠে বর্তমানে, সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ এবং ব্যক্তি সমর্পিত হয় সমাজের হাতে, বিভিন্ন মাত্রায় সংরক্ষিত হয়।

স্মৃতির অপর নাম পরম্পরা। এটি শ্রুতি ও কর্মের সূত্র ধরে আসে, সংরক্ষিত হয়। কেন? মানুষ জানে অভিজ্ঞতা মূল্যবান; এর বাছাই করা অংশগুলো প্রয়োজনীয়। প্রকৃতির সঙ্গে মিলন বা সংঘাতের প্রসঙ্গ, প্রাপ্তিযোগ, সামাজিক বিধিবিধান বা বিজয়ীর বীরত্বগাথা স্মরণযোগ্য। এজন্যই আদি শাস্ত্রগুলো শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদের আরেক পরিচয় স্মৃতিশাস্ত্র। যা আমরা ধারণ করি তা ধর্ম, স্মৃতিও ধর্ম-পরম্পরার রক্ষাকবচ। এই প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে তৈরি হয়েছে বিধিবদ্ধ ছন্দ ও মিলের ধারণা বা শ্রুতিকাঠামো। এর মাধ্যমে পরিচিত শব্দ পরিচিত কাঠামোর ভেতরেও অপরিচিতিকরণের অংশভুক্ত হয়; তৈরি হয় স্মরণযোগ্য বাক্য, পঙ্‌ক্তি, শ্লোক। কবিতার

জন্মমূলে রয়ে যায় স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির ধারণা, অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ বা দার্শনিকতা। এ তো গেল মানসিক পরিস্থিতি; এর সামাজিক বস্তুভিত্তি কেমন হবে? কীভাবে দৃশ্যগ্রাহ্য হবে মনের ধর্ম? কীভাবেই-বা সংরক্ষিত বা স্মৃতিময় হবেন কীর্তির কর্তা?

মৃত্যু অনিবার্য; প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তবু প্রশ্ন জাগে, জীবনের স্বাদ পায় কতজন? আমরা কেবল জানি জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ের নাম জীবন। কিছু কাজ, কিছু মায়া মিলিয়ে যে সামাজিক সম্পর্ক তাতে জীবনের অবয়ব বা অর্থ তৈরি হয়। জীবনের দুটি প্রান্তিক কাঠামোর মতো থাকে জন্ম ও মৃত্যু। যেহেতু মাতৃগর্ভে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আপাতত নেই, মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী; তাই 'মায়া রহিয়া গেল' বলেই পুনর্জন্ম, পুনরুত্থান বা পরকালের কথা বলি আমরা! তবু সেসব বহুদূর; যা কিছু হারাই, হারাতে কি চাই! স্মৃতির মূল নড়ে ওঠে, তাকে দৃশ্যমান করার জন্যই সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এসব প্রবণতা নতুন নয়। মানুষের জন্য 'অস্তিত্ব' একটু কঠোর শব্দ, কিছুটা বিরোধমূলক; কেননা অবসানের বিপরীত প্রান্তে এর অবস্থান হলেও 'অস্তিত্বহীনতা'র ভয় থেকেই এ সম্পর্কিত সচেতনতার জন্ম হয়। এজন্য জীবন ভালোবাসার মতোই নরম ও আদিম; তদুপরি মানুষ অলীক নয়, রক্তমাংস-স্নায়ুর মায়া নিয়েই তার পরিচিতি।

মায়া থাকে অন্তরে। সেটা চাক্ষুষের জন্য জন্ম হয় দৃশ্যের এবং দৃশ্যের থাকে বস্তুভিত্তি। জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য প্রাণহীনতায়। মৃত্যুতে প্রাণ তো বায়বীয় হয়ে গেল, রয়ে গেল দেহবস্তু। এই দেহ দৃশ্যমান রাখা যায়, গোপন করা যায়, খাওয়া যায় বা পঞ্চভূতের অংশভুক্ত করে দিয়ে ভবিষ্যৎ মিলন বা পুনরাবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা করা যায়। অনেকগুলো পথ, গন্তব্যও এক নয় অথচ মায়া থাকে সর্বত্র। এই প্রক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে একক ব্যক্তির অধিক 'সমাজের লোক'—মানুষ; এই মানুষ আত্মীয়স্বজন, ভাই-বোন, পিতা-মাতা অথবা প্রাণের শত্রু হতে পারে। তাই সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্কও অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে আছে বস্তুসংগ্রহের ব্যাপার, এর কিছু সম্পদ, কিছু বিপদ। বস্তুতে বা অবস্তুগত প্রাণের সম্পর্কে সামাজিক অবস্থান প্রতিনির্ণীত হয়। এজন্য ভালোবাসায় বা ক্ষমতায় সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার জন্মায় সামাজিকভাবে। শত্রুকে কি মানুষ স্মরণ করে না? করে, বিশেষভাবেই করে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে বহু। বিজয়ীর গৌরবগাথা তৈরির অনিবার্য উপাদান পরাজিতের বিবরণ। তবে বিজয়ীর গল্পগাথা ইতিহাসের মেরুদণ্ড, এটা মানতেই হবে।

আবেগ, প্রয়োজন, সামাজিক দায় বা ইতিহাসের অনিবার্যতা মিলিয়ে তৈরি হয় স্মৃতি ও সংরক্ষণের বাস্তবতা। স্মৃতি ধারণের নাম ইতিহাস; বস্তুগত সংরক্ষণ বা গল্পগাথায় হাজির হয় তার প্রমাণ। পরিবারে, সমাজে, রাজনীতিতে বা ধর্মে ইতিহাস থাকে। স্মৃতি সংরক্ষণ বা বাছাইয়ের দায়িত্বটা প্রধানত কালের হাতে অর্পিত হয়; এই সূত্রে কেউ হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে, কাউকে হাজির করা হয় আয়নার মতো প্রতিনিয়ত আত্মদর্শনের প্রয়োজনে। এতে সংস্কৃতি থাকে, স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদও অস্বীকার করা যায় না; তবে ক্ষমতাও অন্যতম নিয়ামক। ক্ষমতা যেমন ইতিহাস নির্মাণের সাধারণ প্রবণতা, স্মৃতিও অনেকটা তার হাতে বন্দি। ক্ষমতা ইতিহাস নির্মাণ করে, তৈরি করে স্মৃতির দৃশ্য ও দর্শন। এই সূত্রে মৃত্যুকে অস্বীকার করা না গেলেও